Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 43-49
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম : একটি অনুসন্ধান

রিন্টু দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Kailaschandra Singha is well-known as a creator of 'Rajmala', the History of Tripura. At present it is very necessary to re-find the forgotten writer Kailaschandra. Not only in History, he had equal eagerness in Archeology, Literature and Music. He wrote many essays on these in different contemporary journals. He was born on 1851 A.D. in the village Kalikachchha in Tripura. His searching was extended to many part of India. He worked as a Finance Secretary under the king of Tripura. He was connected with Rabindranath and Jyotirindranath Tagore too. He was appointed as an estate manager of Tagore family in Odissa. He also took the responsibility of Assistant Secretary of the 'Adi-Brahma Samaj' when Rabindranath Tagore was the Secretary of the same. He wrote many essays on the history of Odissa, Bengal and Cooch Behar kingdom. His keen interest was on Biography, Sanhita, Archeology and Music. He was praised by Debendranath Tagore as an Archeologist. He was also honoured by Dineshchandra Sen as a Historical Preceptor. Kailaschandra and his creation can help us in establishing the truth against the confusions of History. Besides, the creation of Kailaschandra can play an important role on the research of History and Archeology as well as to open the facts and truths of ancient Literature.

Key words: History, Archeology. Literature, Music, Rabindranath, Jyotirindranath, Dineshchandra Sen.

'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণেতা হিসাবে কৈলাসচন্দ্র সিংহ সমধিক পরিচিত। যদিও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সমকালে তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্মকুশলতা বিদগ্ধ সমাজে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল। কৈলাসচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৮ আষাঢ় ত্রিপুরার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে কৈলাসচন্দ্রের পিতা গোলোকচন্দ্র সিংহ, সাধক বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বামী) প্রমুখের উদ্যোগে কালিকচ্ছ গ্রামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পাঁচ বছর বয়সে এই বিদ্যালয়েই তাঁর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। বছর তিনেক সেই স্কুলে পড়ার পর স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। আট বছর বয়সে পরিবার থেকে দূরে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি স্কুলে পড়তে যান। দেড় বছর সেখানে অধ্যয়নের পর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বেশিদিন লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। এর কিছুদিন পর প্লীহার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সময় পর আরোগ্যলাভ করেন। পুনরায় স্কুলে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তা আর হয়ে ওঠেনি কৈলাসচন্দ্রের। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এন্ট্রান্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর আগে তের বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেছিলেন। কাজেই সংসারের দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁর ওপর চলে আসে।

কৈলাসচন্দ্রের পিতা গোলোকচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরাধিপতির রাজস্বসচিব ছিলেন। ১২৪০ বঙ্গাব্দে নিযুক্ত হয়ে বত্রিশ বছর বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজকার্য নির্বাহ করেছেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রও ত্রিপুরার রাজসরকারের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত হন। স্কুলের পাঠ শেষ হলেও সরকারি কাজের অবকাশে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত ছাড়া 'দুর্গাভক্তি চিন্তামণি', 'মায়াতিমির চন্দ্রিকা', 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শুধু গ্রন্থপাঠ নয়, লেখালেখির প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ জন্মায়। ১৭-১৮ বছর বয়সে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু হিতৈষিণী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'প্রেরিত পত্র' এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। আঠারো বছর বয়সে একটি উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা মুদ্রিত হতে পারেনি। কুড়ি বছর বয়সে রাজপরিবারের সঙ্গে বিবাদের জন্য তিনি আগরতলা পরিত্যাগ করেন। সেই সময় ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে প্রয়াত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে তৎকালীন মহারাজের বিবাদ শুরু হয়। কৈলাসচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং মোকদ্দমার সকল ভার নিজ দায়িত্বে পালন করেন।

রাজপরিবারের সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িত থাকার সময় পুরানো দলিলপত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই সময় 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী' 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় এই গ্রন্থটি সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র হাইকোর্টের উকিল পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতীও এই গ্রন্থের প্রশংসা করেছিলেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালীশিক্ষার পাঠ কৈলাসচন্দ্র পেয়েছিলেন এই প্রাণনাথ সরস্বতীর কাছ থেকে। পরবর্তী সময়ে পরিবর্ধিত আকারে 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' রচনা করেন কৈলাসচন্দ্র। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি মূলত 'প্রাচীন রাজমালা', 'সংস্কৃত রাজমালা' ও 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' বা 'কৃষ্ণমালার' সাহায্য নিয়েছেন। এছাড়াও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্র, রিপোর্ট এবং বিভিন্ন পুথি, মুদ্রা, শাসনপত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি প্রণিত 'History of Relations of the Government with the Hill-Tribes of the North-East Frontier of Bengal' গ্রন্থটিও ত্রিপুরার ইতিহাস লিখতে তাঁকে সাহায্য করেছে। ত্রিপুরার ইতিহাসের 'রাজমালা' নামকরণ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন,

> *"যদিচ ত্রিপুরার চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য সমূহের ইতিহাস, ভ্রমণকারিদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অন্যান্য হস্তলিখিত পুথি, শাসনপত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তত্রাচ সেই প্রাচীন গ্রন্থের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসকে রাজমালা আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছি।"*[৯]

১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'পরাশরসংহিতা'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গ্রন্থটির একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি যা উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়া তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' অনুবাদ সহ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে প্রথম সংস্করণের ১৫০০ কপি বই অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নতুন সূচনা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া উপনিষদ, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন থেকে

টীকা সংযুক্ত হয়েছে এই গ্রন্থের অনুবাদে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কৈলাসচন্দ্র রচিত 'শ্রীদারুব্রহ্ম' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জগন্নাথদেবের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন,

> *"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীকরকমলে "শ্রীদারুব্রহ্ম" ভক্তি উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।"*[২]

কৈলাসচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল প্রাচীন কীর্তিকলাপ-পূর্ণ উড়িষ্যাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা। সেই ইচ্ছা পূরণ না হলেও উড়িষ্যার ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় জগন্নাথদেবের বিবরণের সারাংশ সংস্কৃত, উড়িয়া ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে 'শ্রীদারুব্রহ্ম' নামে সংকলিত করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি জানিয়েছেন,

> *"প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উড়িষ্যার ইতিহাসের অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম।"*[৩]

এগুলি ছাড়াও বাংলার বিখ্যাত সাধকদের সংগীত সংগ্রহ করে 'সাধক সঙ্গীত' (১ম ও ২য়) নামে প্রকাশ করেন তিনি।

কৈলাসচন্দ্র ফরাসি বীরাঙ্গনার জীবন অবলম্বনে 'জোয়ানের জীবনচরিত' রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটিও বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। গ্রন্থটির ভাষা সম্পর্কেও অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছিল ক্যালকাটা গেজেট, বোম্বে গেজেট, ক্যালকাটা রিভিও প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর কৈলাসচন্দ্র পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে কৈলাসচন্দ্র কলকাতায় আসেন। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের তিন মাস বাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে উড়িষ্যার জমিদারী পরিচালনার জন্য ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করেন। উড়িষ্যায় গিয়ে কৈলাসচন্দ্র 'উড়িষ্যা যাত্রা' ও 'উড়িষ্যার ইতিহাস' নামে প্রবন্ধ লেখেন। উড়িষ্যার জমিদারীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালেখি করতেন। এরপর কৈলাসচন্দ্র পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় জ্ঞানপিপাসু কৈলাসচন্দ্র অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। এই সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর তিনি পুনরায় জমিদারী সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত হন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ত্রিপুরায় ফিরে আসেন।

ত্রিপুরায় আসার আগে কৈলাসচন্দ্র একটি বিশেষ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বাংলায় একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। দুর্ভাগ্যবশত ঘরে আগুন লেগে পাণ্ডুলিপির প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। নটি খণ্ডে কাজটি শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। কেমন ইতিহাস লিখবেন তার নমুনা হিসাবে 'সেন রাজগণ' নামে একটি অধ্যায় ১২৯১ সনের 'ভারতী'তে প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন,

> *"যে দিবস স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিতে পারিব সেই দিবস আমার মহাপূজা শেষ হইবে। অদ্য প্রথম অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।"*[৪]

ত্রিপুরায় ফিরে এসে কৈলাসচন্দ্র 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' লেখেন। ত্রিপুরার ইতিহাস তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে অন্যতম কীর্তি। ক্যালকাটা গেজেটে এই গ্রন্থের প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল,

"It contains a mass of interesting information and is a valuable contribution to the historical literature of Bengal."[৫]

পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কৈলাসচন্দ্রের কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি নিবিড় আস্থা ছিল না। কখনো তিনি বেদান্ত চর্চা করতেন, কখনো ব্রহ্মোপসনায় নিরত থাকতেন, কখনো আবার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। 'রাজমালা' প্রকাশের কয়েক বছর পর তিনি শ্যামা বিষয়ক সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তখন থেকে তিনি একনিষ্ঠ শক্তির উপাসক হয়ে যান। এই সময়ে তিনি 'কাঙ্গালের গীত' ও 'কাঙ্গালগীতা' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মোট ১৪৫টি ভক্তিমূলক সংগীত রচনা করেছেন। সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু তাঁর কাঙ্গালগীতা'র প্রশংসা করে লিখেছিলেন,

"কাঙ্গালগীতা অতি ক্ষুদ্র পুস্তক কিন্তু গুরুতর কথায় পরিপূর্ণ। সকল কথাই অমূল্য। জীবন উন্নত ও পবিত্র করিতে হইলে এই সকল কথা জপমালার স্বরূপ হৃদয়ে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।"[৬]

শেষ জীবন তিনি ধর্মচর্চা ও গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি তাঁর লাইব্রেরির অধিকাংশ মূল্যবান ইংরেজি গ্রন্থ কলকাতার সাহিত্য পরিষদে দান করে দেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৪ পৌষ কৈলাসচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে।

কৈলাসচন্দ্রের বেশিরভাগ প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। সমকালে ঐতিহাসিক তথ্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের সঙ্গে আলোচনা, সমালোচনা ও বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৈলাসচন্দ্রকে 'পুরাতত্ত্বদর্শী' নামে অভিহিত করেছিলেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ছাড়া সাহিত্যের প্রতিও তাঁর আগ্রহ নিতান্ত কম ছিল না। দীনেশচন্দ্র সেন-এর 'মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য' প্রবন্ধের আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক তথ্য সহ সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন কৈলাসচন্দ্র। এছাড়া 'সাহিত্য' পত্রিকায় দীনেশ্চন্দ্র সেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে দীনেশচন্দ্রের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন তিনি। দীনেশচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই কৈলাসচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন তিনি। কৈলাসচন্দ্রকে লিখিত দীনেশচন্দ্র সেনের একটি পত্রের উল্লেখ করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে,

"কুমিল্লা।
"২৩ শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ

"প্রিয় কৈলাস বাবু!

"অক্রূর বাবু 'মায়াতিমির চন্দ্রিকা' ও 'হরিভক্তিবিলাস' নামক দুইখানা হস্তলিখিত পুস্তক আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, গ্রন্থ দুইখানা পূর্ব্ববঙ্গের রচনা ও কবিত্বপূর্ণ। আপনি পুনর্ব্বার এখানে আসিলে দেখিতে পারিবেন।

শ্রাবণের সাহিত্যে 'পরাগলী মহাভারত' শীর্ষক প্রবন্ধ অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত লিখিত হয়, আমার বিশ্বাস ছিল, আমি মূলে নসরত খানকে পরাগলের খুল্লতাত বলিয়াই পড়িয়াছিলাম; এ বিষয়ে আপনি প্রবন্ধ রচনার পর আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মূল দৃষ্টে দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার ভ্রম; মূলে শুধু এই দুইটি কথা আছে,

'শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।'

"বস্তুতঃ পিতার নাম রাস্তি খানের পরেই নসরত খানের নাম দেখিয়া আমার এইরূপ ভুল হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিয়া আমি পুনর্বার সংশোধন করিতে অবকাশ পাই নাই।

"ঐ প্রবন্ধে আর একটা বড় ভুল আছে। ২৫১ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছি,

'ছায়াশূন্য রবিশশী পরিমিত শক,
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।'

প্রথম পংক্তির 'রবি' স্থলে মূলে 'বেদ' আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা না হইলে কিছু অর্থই হয় না। এই শ্লোকের 'ছায়া' শব্দের অর্থ আপনি কি করেন?

"পূর্ব্ববঙ্গের কবিদিগকে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব কিনা, এই ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না। ইতি

"আপনার স্নেহের
দীনেশ।"

"পুঃ- এই ভ্রমসঙ্কুল প্রবন্ধটিতে আর একটি প্রমাদ করিয়াছি, ২৫২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীকরনন্দী' স্থলে শ্রীসূরনন্দী হইয়াছে। আপনি আমার ঐতিহাসিক গুরু। এতগুলি পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবেন।"[৭]

আমরা দেখতে পাচ্ছি দীনেশচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের কাছে শুধু পরামর্শই চাননি; কৈলাসচন্দ্রকে তিনি 'ঐতিহাসিক গুরু' হিসাবেও বরণ করে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দীনেশচন্দ্র সেনের প্রশ্নের জবাবে কৈলাসচন্দ্র 'ছায়া' শব্দের অর্থ করেছিলেন 'শূন্য'। দীনেশচন্দ্রের পত্রে বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে'র যে দুটি পংক্তি উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বিতীয় পংক্তির শুরুতে 'সনাতন' না হয়ে 'সুলতান' হওয়া উচিত। কৈলাসচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন,

*"দীনেশবাবু গত অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" এই মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎপাঠে আমরা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছি। কারণ, তিনি ৫২১ পৃষ্ঠায় চারটি * চিহ্ন দিয়া যে অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান।"*[৮]

তারপর দীনেশচন্দ্র শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তা উল্লেখ করে পরিত্যাজ্য দশটি পংক্তি জুড়ে দিয়ে তার ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন কৈলাসচন্দ্র। দীনেশচন্দ্রের পরিত্যাজ্য যে দশটি পংক্তি * চিহ্ন দিয়ে কৈলাসচন্দ্র যুক্ত করেছেন সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে,

* ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
* পর্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।।
* গজবাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
* মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ।।
* অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
* তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুরনৃপতি।।
* আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
* সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে।।
* দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
* যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততী তাহান।।

দীনেশচন্দ্রের এই পদ্ধুলি গোপন করার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে পাননি কৈলাসচন্দ্র। শ্রীকর নন্দী আশ্রয়দাতা ছুটি খাঁর গুণকীর্তন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করেছেন। কৈলাসচন্দ্রের মতে,

> *"ছুটি খাঁর ভয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "গজ বাজি কর" প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন, এই সকল বর্ণনা, তোষামোদকারী কবির প্রলাপবাক্য; আমরা ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।"*[৯]

কৈলাসচন্দ্র দীনেশচন্দ্র সেন-এর ১৩০১, মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য' প্রবন্ধের সমালোচনা লিখেছেন 'পদ্মাবতী সম্বন্ধে মন্তব্য' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র উৎকর্ষের কথা বলেছেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র ও গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত হামিদুল্লার অজ্ঞতার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শেষে কৈলাসচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,

> *"বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় হামিদুল্লা মহাশয়ের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, এ জন্য আলাওল কবির সোনার "পদ্মাবতী" তাঁহার হস্তে পড়িয়া মাটীতে পরিণত হইয়াছে।"*[১০]

এই ধরণের সত্যানুসন্ধান ও ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় পরিচয় বহনকারী বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন কৈলাসচন্দ্র।

কৈলাসচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ছিল প্রগাঢ়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন নিরলস। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে সেই নিষ্ঠা, সততা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। বিস্মৃতপ্রায় কৈলাসচন্দ্র ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম আমাদের ইতিহাসের বিভ্রান্তি দূর করে ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত, আশ্বিন ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, 'ভূমিকা' অংশ।
২। 'শ্রী দারুব্রহ্ম', কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, 'উৎসর্গপত্র'।
৩। ওই, 'বিজ্ঞাপন' অংশ।
৪। 'কৈলাসচন্দ্র সিংহ'- মণীন্দ্রকিশোর সেন, 'প্রতিভা' ফাল্গুন ১৩২১, পৃষ্ঠা ৪৫২।
৫। 'ক্যালকাটা গেজেট", ৩০ জুন ১৮৯৭।
৬। প্রাগুক্ত, 'প্রতিভা' ফাল্গুন ১৩২১, পৃষ্ঠা ৪৫৩।
৭। 'বাদপ্রতিবাদ'- কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'সাহিত্য', চৈত্র ১৩০১, পৃষ্ঠা ৭৯৯-৮০০।
৮। ওই, পৃষ্ঠা ৮০২।
৯। ওই, পৃষ্ঠা ৮০৩।
১০। 'পদ্মাবতী সম্বন্ধে মন্তব্য'- কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'সাহিত্য', মাঘ ১৩০১, পৃষ্ঠা ৬৯৩।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অশোক কুমার কুণ্ড : 'বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ' (সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী), ১১ খণ্ড, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯।
২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ (সম্পাদক) : 'পরাশরসংহিতা', প্রকাশক- সুরেশচন্দ্র সিংহ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
৩। কৈলাসচন্দ্র সিংহ : 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', প্রকাশক- যোগেশচন্দ্র সিংহ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
৪। কৈলাসচন্দ্র সিংহ : 'শ্রীদারুব্রহ্ম', প্রকাশক- সুরেশচন্দ্র সিংহ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
৫। কৈলাসচন্দ্র সিংহ (সম্পাদক ও অনুবাদক) : 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', প্রকাশক-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

৬। শশিভূষণ বিদ্যালংকার : 'জীবনী কোষ' (ভারতীয় ঐতিহাসিক), ২য় খণ্ড, প্রকাশক- দেবব্রত চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১। অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক) : 'প্রতিভা', ১৩২১, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়, ঢাকা।
২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক) : 'সাহিত্য', ১৩০১, সাহিত্য কার্য্যালয়, কলকাতা।
৩। Govrnment of Calcutta : 'The Calcutta Gazette', 1897 (January-June Supplement) Calcutta।